# মেদিনীপুর টাউন স্কুলের সংগ্রামী অতীত

শক্তিপ্রসাদ দে

আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের ভালোবাসার 'মেদিনীপুর টাউন স্কুল' আজ ১২৫ বছর অতিক্রান্ত। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন এই বিদ্যালয়ের বহুছাত্র নিজেদের করেছিলেন নিয়োজিত—বহুবিপ্লবী, বহুশহীদের নাম জড়িয়ে আছে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো, শহীদ অনাথবন্ধু পাঁজা, শহীদ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, শহীদ রামকৃষ্ণ রায়, নরেন্দ্রনাথ দাস, হরিপদ ভৌমিক, বীরেন্দ্রনাথ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ দাস, পরিমল রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, অমর চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই মহান বিপ্লবীদের দেশপ্রেম বর্তমান পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিপ্লবী আন্দোলনের লীলাভূমি মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে—বাংলায় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে চারটি দল গঠিত হয় তার মধ্যে তিনটি কলকাতায়, একটি মেদিনীপুরে। সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মেদিনীপুর সোসাইটি - ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। সেই চির সংগ্রামী মেদিনীপুরেরই বীর সন্তান হেমচন্দ্র কানুনগো আমাদের টাউন স্কুলের কৃতি ছাত্র যার নাম ভারত ইতিহাসের পাতায় আজও সমুজ্জ্বল।

দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করবার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র ঘর-সংসার ছেড়ে, নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করে ১৯০৬-এর জুলাইতে বোমা তৈরীর কৌশল শেখার উদ্দেশ্যে প্যারিস পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় স্বনামধন্য প্রবাসী ভারতীয় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামার। এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মাদাম কামার উৎসাহে হেমচন্দ্র কর্তৃক ভারতের প্রথম ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করা। ১৯০৭-এ জার্মানীর স্টুটগার্ড শহরে যে আন্তর্জাতিক সভা হয়, সেই সভাতে মাদাম কামা ব্রিটিশ শাসনের তীব্র বিরোধীতা করে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এভাবে হেমচন্দ্র উপরোক্ত দু'জনের আন্তরিক সহায়তায় বোমা তৈরীর কৌশল আয়ত্ত করে দেশে ফিরে যোগ দিলেন অরবিন্দ-বারীন্দ্রের পরিচালনাধীন কলকাতার বিখ্যাত মুরারীপুকুর বোমা তৈরীর কারখানায়। তাঁর তৈরী প্রথম বোমা বিক্ষিপ্ত হয় ১৯০৮-এর ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রকে লক্ষ্য করে। যদিও তা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বোমা বই এর আকারের স্প্রিং লাগানো—লক্ষ্য—অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। কিন্তু তিনি যথাসময়ে বই না খোলায় বেঁচে যান। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ১৯৯১-এর জানুয়ারিতে 'কলকাতা - ৩০০' প্রদর্শনীতে কলকাতা পুলিশের স্টলে প্রদর্শিত হয়েছিল। তৃতীয় ইতিহাস বিখ্যাত বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর মাধ্যমে—লক্ষ্য পুণরায় কিংসফোর্ড—যদিও উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

মজঃফরপুরে বোমা পড়ার ঘটনার দুদিন পর মুরারীপুকুরের আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করল বিপ্লবীদের বোমার খোল, রিভলবার, ডিনামাইট সহ বহুপুস্তিকা। অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন হেমচন্দ্র। বিচারে তাঁর আন্দামানে দ্বীপান্তর হয়। নির্ভীক হেমচন্দ্রের কাছ থেকে পুলিশ কোন তথ্যই বের করতে পারেননি। ১৯২১-এ তিনি মুক্তি পান। তাঁর কর্মকাণ্ড মেদিনীপুর তথা বাংলার যুব সম্প্রদায়কে করেছিল উদ্বেলিত। তাঁর অপর বিখ্যাত অবদান তাঁর লিখিত 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'—সম্ভবতঃ বাংলায় রচিত প্রথম স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ।

এরপর উল্লেখ করতে হয় ১৯২০-র দশকের শেষার্ধের কথা—"Bengal volunteers"-এর নেতৃত্বে বিপ্লব আন্দোলনের কাহিনী যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ ধারণ করে। কলকাতায় এর প্রধান কেন্দ্র হলেও বিভিন্ন জায়গায় এর শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে যাদের মধ্যে ছিল অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। সুভাষচন্দ্র বোস ও



Scanned by CamScanner

দীনেশ গুপ্তের আদর্শে গঠিত এই দলের মেদিনীপুর শাখা গঠনের কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন পরিমল কুমার রায় ও প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠী। পরিমল রায় যখন মেদিনীপুর টাউন স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র, সেসময় প্রফুল্ল কুমার এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করে তারা অন্যান্য ছাত্রদেরও অনুপ্রাণিত করেন। পরিমল রায় এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে 'মিলন মন্দির' নামে একটি সংস্থা গঠন করে দেশাত্মমূলক গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। তাঁরা গঠন করেন ১৯২৮-এ যুবসংঘ—এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন হরিপদ ভৌমিক ও ফণী কুণ্ডু প্রমুখ। এইসময় ১৯২৮-২৯ সালে "সারদা আইন" (বিবাহের ন্যূনতম বয়স —নারীদের ১৪, পুরুষের ১৮ সংক্রান্ত আইন) পাশ হলে মেদিনীপুর টাউন স্কুলে প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষের প্রতিবাদ মিটিং চলাকালীন মেদিনীপুরের বিপ্লবী যুবকেরা এই সভা ভণ্ডুল করে দেয় এবং এই আইনের সমর্থনে একটি রেজলিউশন পাশ করে—যা তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পাশাপাশি সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেই হরিপদ ভৌমিকের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর কলেজে পড়াকালীন পরিমল রায়, দীনেশ গুপ্তর সাক্ষাৎ হলে মেদিনীপুরের যুবসংঘটি অনেক সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করে, তা পরিবর্তিত হয় "Bengal Volunteers"-এ। পরবর্তী সময়ে যুবসংঘের প্রকাশ্য সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি সম্মেলনে যোগদানকারী যুবকদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মেদিনীপুরের বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের মধ্যে B.V.-র প্রভাব ক্রমশঃ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ব্রজকিশোর-অনাথবন্ধু-মৃগেন্দ্রনাথ সহ টাউন স্কুলের ছাত্র সমাজের অনেকেই এর সদস্যপদ গ্রহণ করে।

মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্র অমর চ্যাটার্জী কৈশোরেই B.V.-র দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। গোষ্ঠীতে নবনিযুক্ত সদস্যদের বই, পত্র পত্রিকা সরবরাহ ও তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। 'B.V.' দলের সংগঠন প্রধানত শহরকেন্দ্রিক হলেও বিপ্লবী হরিপদ ভৌমিকের কর্মতৎপরতায় কাঁথিতে বিস্তারলাভ ঘটে। তাছাড়া তা বিস্তৃত হয় খড়্গপুর, ডেবরা প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রখ্যাত বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ দাসের ভাষায়, "The history of the revolutionary movement in Midnapore in the thirties was the history of the Bengal volunteers."

১৯২৯-এ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ১৩ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন দাশের দীর্ঘ অনশনে মৃত্যু হলে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ বিরোধী যে বিক্ষোভের ডাক দেন, তা মেদিনীপুরে এই B.V. দলের মাধ্যমে হরতালের রূপ ধারণ করে।

এরপর উল্লেখ করতে হয় ১৯৩১-৩২-৩৩-এর ইতিহাস কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট পেডি-ডগলাস-বার্জ হত্যার ইতিহাস। ১৯৩১-৩২ পরপর দুবছর এপ্রিল মাসে পেডি-ডগলাস নিহত হবার পর স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত, স্তম্ভিত। বিপ্লবীদের পরের লক্ষ্য বি.ই.জে. বার্জ, মেদিনীপুরের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য যিনি গ্রহণ করেছিলেন আক্রমণাত্মক ও পীড়নমূলক পন্থা। ১৯৩৩-এর এপ্রিলে তিনি ছিলেন অনেকটা অন্তরালে। তাই বিপ্লবী শান্তি সেন ও মৃগেন দত্ত সেই সাথে চেষ্টা করেন পুলিশের এস.পি. ইভান্সকে মারার জন্য—যদিও তা ব্যর্থ হয়। বার্জ এপ্রিল মাসের পর প্রকাশ্যে এলে তাঁকে মারার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়, তৃতীয়বারে সাফল্য আসে।

১৯৩১-এর ৭ই এপ্রিল বিমল দাশগুপ্ত-যতিজীবন ঘোষের মাধ্যমে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রদর্শনীকক্ষে প্যাডি নিহত হবার পর অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন পরিমল কুমার রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠীও। মেদিনীপুর শহরে নেমে আসে পুলিশী নির্যাতন।

১৯৩২ এর ৩০শে এপ্রিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য প্রভাংশু পাল কর্তৃক হিজলীর বন্দী নিবাসের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস নিহত হবার পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন নরেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন্দ্রনাথ দাস সহ মেদিনীপুরের সংখ্যা গরিষ্ঠ যুবসম্প্রদায়। অমানুষিক, নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ দাসের ওপর তথ্য বের করার জন্য।



Scanned by CamScanner

এরপর ১৯৩৩। মেদিনীপুরের অধিকাংশ বিপ্লবী তখন বন্দী। স্থানীয়ভাবে তখন ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর ওপর বিপ্লবী আন্দোলনের দায়িত্বভার ন্যস্ত। প্রধান সাহায্যকারীর ভূমিকায় প্রভাংশু শেখর পাল ও রামকৃষ্ণ রায়। মূল দায়িত্ব এবং কলকাতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও অস্ত্র আদান-প্রদানের দায়িত্ব ছিল প্রভাংশু পালের হাতে। বার্জ হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় রিভলবার তিনিই ব্রজকিশোর, অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্রনাথকে সরবরাহ করেন।

অবশেষে এল ১৯৩৩ এর স্মরণীয় ২রা সেপ্টেম্বর। শহরের একপ্রান্তে পুলিশ গ্রাউণ্ডে দুটি ক্লাবের ফুটবল খেলা উপলক্ষে বার্জকে মাঠেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে সুকৌশলে মিশে গিয়ে আক্রমণ করেন মৃগেন দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা। ঘটনাস্থলেই বার্ডের মৃত্যু হয়। পুলিশের প্রতি আক্রমণে দু'বিপ্লবীও নিহত হন। ঐ ঘটনার সূত্র ধরেই ধরা পড়েন নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় ও ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৪ ব্রজকিশোর এবং রামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসি হয় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে। পরের দিন একই সময়ে বিপ্লবী নির্মলজীবনের। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের গ্রন্থ থেকে এই দুই মহাজীবনের জেল থেকে লেখা বিভিন্ন চিঠির পরিচয় পাওয়া যায়।

পরপর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী না হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত পি.জে., গ্রিফিথ জেলাশাসকের দায়িত্ব নেবার পর ফাঁসির মঞ্চে ব্রজকিশোর তাঁকে নির্ভীককণ্ঠে বলেছিলেন, "Thank you very much, Sir, for giving me a chance of dying for my country." যা শুনে গ্রিফিত হয়েছিলেন অতিমাত্রায় বিস্মিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী ব্যাপকমাত্রায় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত, সেক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্রদের নির্ভীক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তা অনস্বীকার্য, একদিকে যেমন চরমপন্থা ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রতি ছিল তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ, সেরূপ অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনও তাদের যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

একদিকে বিদ্যালয়ের এক সময়ের সভাপতি অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যেমন ছিলেন মেদিনপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামী, পাশাপাশি অহিংস পন্থায় পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র শচীন মাইতি, পূর্ণ চক্রবর্তী, নগেন সেন, মৃত্যুঞ্জয় জানা প্রমুখ। ১৯৩০-এ আইন অমান্যকেও কেন্দ্র করে শহরে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলন বন্দী সত্যাগ্রহীদের অনেকের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ দাসও। সেইসঙ্গে অনুশীলন সমিতির নেতা হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ দাস, বিজয় ঘোষ, অজয় ঘোষ, রাধারমণ চক্রবর্তী, শশধর পাল প্রমুখের নাম স্মরণীয়। সর্বোপরি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক, বিদ্বান প্রথম এম.এ., বি.এল., পি. আর.এস. কার্তিক চন্দ্র মিত্রের নাম যার হাত ধরেই এই বিদ্যালয়ের যাত্রার সূচনা। তাঁদের সকলের অবদান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর পরেও চির ভাস্বর, চির উজ্জ্বল।

Scanned by CamScanner